সত্যজিৎ-ভাবনা

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

সত্যজিৎ-ভাবনা
উজ্জ্বল চক্রবর্তী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৩৭৫ টাকা

SATYAJIT-BHABNA a collection of essays on Satyajit Ray by Ujjal Chakraborty
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Second Edition: July 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 375 Taka RS: 375 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-92190-7-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্তী
আমার মা
যিনি আমার হাত ধরে সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে শিখিয়েছেন

এই লেখকের অন্যান্য বই

১. সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রে চরিত্র-চিত্রণ (ভাষণ-পুস্তিকা) ... ১৯৯৩
২. যুদ্ধের গায়েন কড়খইয়া (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ... ২০০০
৩. The Director's Mind ... ২০০৮

ভূমিকা

নতুন করে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলো দেখতে গিয়ে আজ নানা প্রশ্ন জন্ম নেয় আমাদের মনে। যেমন 'চারুলতা' প্রসঙ্গে এত দিন আমরা মনে করেছি, চারুর একাকিত্বের একমাত্র কারণ ভূপতি। চারুর এই ব্যস্ত স্বামীর মনটা সব সময় ডুবে থাকে তাঁর কাগজের সম্পাদনার কাজে। চারুকে তিনি সময় দিতে পারেন না। তাই চারু একাকিত্বের শিকার। কিন্তু নতুন করে আজ ভাবতে ইচ্ছে করে—এটাই কি চারুর একাকিত্বের আসল কারণ? কিংবা একমাত্র কারণ? শুধু স্বামীকে দায়ী করা কি একটু অতি-সরলীকরণ নয়? তাই চারুর একাকিত্বের অন্য কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে এই বইয়ে।

এইভাবে আরও নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। যেমন, সত্যজিৎ রায়ের সমস্ত রহস্য কাহিনীর অপরাধীরা বিদ্বান মানুষ। কোনো-না-কোনো বিষয়ে তাঁদের পাণ্ডিত্য কিংবা দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তবু তাঁরা কেন অপরাধী? এই প্রশ্ন থেকেই জানতে ইচ্ছে হয়, শিক্ষিত মানুষের মানবিকতা সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের মনে কি আংশিক সংশয় ছিল? তা-ই যদি হয়, তাহলে কেন ছিল?

আরও কত প্রশ্ন ওঠে। যেমন, 'নায়ক'-এর চিত্রতারকা টাকা-বৃষ্টির যে-স্বপ্নটা দেখেছেন, বাস্তবে তেমন স্বপ্ন কেউ দেখে কি? স্বপ্নটা কি অবাস্তব? তাহলে সেই অবাস্তবতা কি ইচ্ছাকৃত? এই প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা হয়েছে আন্তর্জাতিক সিনেমা ও সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে।

কিন্তু প্রশ্নগুলো উঠছে কেন? কারণ, আমরা কয়েকটি 'দার্শনিক' থিমকে অনুসন্ধান করেছি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে। বুঝতে চেষ্টা করেছি—'স্বপ্ন' বলতে কী বোঝেন তিনি; তাঁর দৃষ্টিতে 'পিতৃমূর্তি', 'নারীসত্তা', 'দাসত্ব', 'একাকিত্ব' ইত্যাদি কেমন। এ-রকম ১৪টি থিম আছে এই বইয়ে। এইসব থিম-এর সূত্রেই এসেছে সত্যজিতের নানা ছবির কথা। থিমগুলো কী-ভাবে তাঁর ছবিতে বিশেষ ব্যঞ্জনা পেয়েছে, তারই সন্ধান করা হয়েছে দীর্ঘ প্রবন্ধগুলোয়।

কখনও-কখনও সত্যজিতের ছোটগল্পেরও দ্বারস্থ হয়েছি আমরা।

একজন দার্শনিক যে-ভাবে কোনো বই পড়েন, সেই পদ্ধতিতে (method-এ) যাতে এই বইও পাঠ করা যায়, সেজন্যই থিমগুলোকে সূচিপত্রে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। তাই বইতে প্রবন্ধের নাম আর থিমের নাম ভিন্ন।

যেমন, এই বইয়ের একটি থিম 'দাসত্ব'। কিন্তু এই থিমের অনুসারী প্রবন্ধটির নাম—'সত্যজিতের চোখে রতন কী—ভৃত্য না ভগ্নী?' কী-ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয় মানুষের হৃদয়—এই প্রবন্ধে আমাদের সন্ধানের লক্ষ্য সেটাই। বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে 'পোস্টমাস্টার' ছবির ছোট্ট মেয়ে রতনকে। একই সঙ্গে খুঁজে নেওয়া হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের ছোটগল্প থেকে আরও চারটি ভৃত্যের চরিত্র। এই চারজনের মধ্যে একটাই মিল। ওরা চারজনই এখন ভৃত্যের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। অতীতে ওরা ভৃত্যের কাজ করত। কিন্তু যা লক্ষ্য করার মতো, তা হলো, মুক্তি পাওয়ার পর ওরা অতীতের সবই ভুলতে পেরেছে; শুধু ভৃত্য হিসেবে যে-কাজটি ওরা করত, সেই সামান্য কাজটুকু ভুলতে পারেনি। তাই যে-মানুষটি ছিল পাংখাবরদার—ইংরেজ প্রভুর শোবার ঘরের পাখা টানাই ছিল যার কাজ—সে মৃত্যুর বহু বছর পরেও, স্বাধীন ভারতেও প্রেত-রূপে এখনও সেই পাখাই টেনে চলেছে। তার মানে এই পাংখাবরদারের অন্তরাত্মায় ঢুকে গেছে দাসত্ব। মৃত্যুর পরও (অর্থাৎ মুক্তির পরও) সে স্বাধীন হয়নি—দাসই রয়ে গেছে।

আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছিল-এই সর্বগ্রাসী দাসত্ব কি ঢুকে গেছে 'পোস্টমাস্টার'-এর রতনেরও অস্থিমজ্জায়? আদতে রতন-চরিত্রটির বীজ লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। রবীন্দ্র-সৃষ্ট কোনো চরিত্র কি অস্থিমজ্জায় দাস হয়ে উঠতে পারে? সেটা কি সম্ভব? এই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। কিন্তু এই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, রতনের হৃদয়কে চেনার জন্য শুধু 'পোস্টমাস্টার' ছবিতেই আমরা নিজেদের বেঁধে রাখিনি। পৌঁছে গেছি সত্যজিতের ছোটগল্পেও। দাসত্ব সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের দার্শনিক ধারণাকে আমরা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে। এই সমগ্রতাকে ছোঁয়ার চেষ্টাই বইটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বইয়ের সবকটি থিমকেই সমগ্র-সত্যজিতের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে। তাই আমাদের আশা, জগৎ-সংসার ও মানবজীবনকে সত্যজিৎ রায় যে-ভাবে দেখেছেন, তা পাঠকের বিশ্বদৃষ্টিতেও হয়তো নতুন কয়েকটি রং ধরাবে।

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

বাংলাদেশের প্রতি নিবেদিত

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম এসেই সত্যজিৎ রায়ের পিতৃভূমিতে ফিরে আসার গভীর অনুভূতি হয়েছিল। ঢাকার এক জনসভায় তিনি এ-কথা বলেছিলেন।

অথচ, সত্যজিৎ যে-দেশের নাগরিক, সেই ভারত সম্পর্কে এমন আবেগময় মন্তব্য কখনো তিনি করেননি। আরও আশ্চর্য, বিশ্বজুড়ে দেওয়া নানা সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ সর্বদাই বলেছেন—বাংলার মানুষের জন্য বাঙালির জীবনকেই তিনি চিত্রায়িত করেন।

সর্বভারতীয় বা বিদেশি দর্শকের দাবির কথা তাঁর মনেও থাকে না। অর্থাৎ, এটা প্রমাণিত সত্য যে, তাঁর মনন ও কল্পনার ভুবন ছিল বাংলা ও বাঙালি-সম্পৃক্ত।

সত্যজিৎ রায়—মানব-ইতিহাসের অলৌকিক প্রতিভাবান এই স্রষ্টা ও দ্রষ্টা—কখনোই নিজেকে 'আন্তর্জাতিক' বলে কল্পনা করেননি। উদাহরণ—তাঁর 'জলসাঘর' ছবিটি কেন ফরাসি দেশের প্রায় সবাই দেখেছেন [এবং দেখেই চলেছেন]—এই রহস্য তিনি ভেদ করতে পারেননি। চেষ্টাও করেননি।

গভীর বাঙালি এই স্রষ্টাকে নিয়ে আমার কয়েকটি ধ্যান-ধারণা ছিল, মূলত যা দার্শনিক ভাবনা। সেইসব চিন্তাকে গ্রন্থাকারে গেঁথে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকার হাতে উপহার দিলেন 'কবি প্রকাশনী'র কর্নধার সজল আহমেদ।

বইটি নিয়ে আমার হৃদয়েও আজ আবেগের ঢেউ উঠেছে। কারণ, বাংলাদেশ আমারও পিতৃভূমি।

উজ্জ্বল চক্রবর্তী
কলকাতা
২০১৭

আমি কৃতজ্ঞ ...

আমার সৃজনশীল অস্তিত্বের অন্তরালে যাঁর আশ্বাসের হাতখানি সবসময় অবিচল—তিনি সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী। আমার কর্মধারার পেছনে তাঁর দান অপরিমেয়।

সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আমার যাবতীয় গবেষণার পিছনে তিন দশক ধরে ইন্ধন ও সমর্থন জুগিয়েছেন **সন্দীপ রায় ও রায় পরিবার**। অথচ আমার স্বাধীন চিন্তাকে ওঁরা কোনোদিন প্রভাবিত করেননি।

আটজন সম্মানীয় সম্পাদক *(কখনো বা বিভাগীয় সম্পাদক)* আমাকে দিয়ে পরম স্নেহে লিখিয়ে নিয়েছেন নানা প্রবন্ধ। তাঁরা হলেন—**সাগরময় ঘোষ** *(দেশ)*, **সমরেশ বসু** *(মহানগর)*, **অপর্ণা সেন** *(সানন্দা)*, **অনিরুদ্ধ ধর** *(সানন্দা ও একদিন)*, **সারা ম্যাক্‌মেনাস-অধিকারী** *(অভ্ এজ)*, **প্রলয় শূর** *(মুভি মনতাজ)*, **সন্দীপ রায়** *(সন্দেশ)* ও **ঋতুপর্ণ ঘোষ** *(রোববার)*। আমার বন্দী ভাবনাকে ওঁরা মুক্তি দিয়েছেন। ওঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উপযুক্ত শব্দ আমার ঝুলিতে নেই।

বইটি প্রকাশে আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসাহ দিয়েছেন **সুবল সামন্ত**। এই বইয়ের প্রস্তাব তাঁরই দেওয়া।

সাংসারিক দায়িত্ব পালনে আমি অপারগ ছিলাম প্রবন্ধগুলো লেখার সময়। আমার সেই অশিষ্ট উদাসীনতা বিনা অনুযোগে সহ্য করেছেন **রাজশ্রী রাহা**, আমার স্ত্রী। লেখার প্রথম পাঠক হিসেবেও আমাকে অকুণ্ঠ উৎসাহ উনি দিয়েছেন।

আমার সমস্ত লেখালেখির পেছনে চার বন্ধুর আগ্রহ সর্বদাই কাজ করে—**অনিরুদ্ধ ধর**, **দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়**, **ড. দীপঙ্কর হোম** ও **ড. ছন্দক সেনগুপ্ত**। তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই এই বই প্রকাশ উপলক্ষ্যে।

দুঃসময়ে ব্যক্তিগত সুপরামর্শ দিয়ে আমার বন্ধু, চিকিৎসক ও গল্পকার **ডা. অনিরুদ্ধ দেব** বই প্রকাশের পথ সুগম করেছেন।

ঘোর সামাজিক সংকট থেকে আমাকে উদ্ধার করে, ক্রমাগত লেখালেখির উৎসাহ দিয়ে গেছেন **নন্দিতা** ও **ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**। নইলে বইটি প্রকাশের অনেক আগেই আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তাম।

সূচিপত্র

ভারতীয়ত্ব

পুণ্যি-পুকুর থেকে উপনিষদ্ ১৩

সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক

চিত্রনাট্যে সাহিত্যের রূপান্তর ২৬

একাকিত্ব

চারুর একাকিত্বের অন্য কারণ ৪০

দাসত্ব

সত্যজিতের চোখে রতন কী?—ভৃত্য না ভগ্নী ৪৭

অপরাধীর মন

ফেলুদার শয়তানরা কেন বিদ্বান? ৫৩

দুই সত্তা

নারী-সত্তা ও পুরুষ-সত্তা—সত্যজিতের চোখে ৬৯

শিশুসাহিত্যের ঋণ

বড়পানি-আঁকিবুঁকি-হাঁস-আগন্তুক ৭৯

স্বপ্ন

'নায়ক'-এর স্বপ্ন কেন আসল-স্বপ্নের মতো নয়? ৯১

শব্দ

নগরজীবনের শব্দ—সত্যজিতের ছবিতে ৯৯

আকাল ও অনটন

দুর্ভিক্ষের মানসিক চিহ্ন ১৩৬

দিনযাপনের ছন্দ

বসা আর চলা ১৪০

নাট্য-চিত্রনাট্যের সেতু

সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের প্রথম ১৫ মিনিট ও গণশত্রু ১৪৫

সম্পাদনায় গণতান্ত্রিক উদারতা

সম্পাদক সত্যজিৎ ১৫৭

পিতৃমূর্তি

মনোবলের জয়গান ১৬৩

বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলা

বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা ১৭২

কলাকৌশল

কলাকৌশলে সত্যজিতীয় অবদান ১৭৯

উপসংহার ১৮৪

পরিশিষ্ট ১৮৫

পুণ্যি-পুকুর থেকে উপনিষদ্

তাঁর কাজের ঘরে এলেই আজও আমাদের আঙুলের ছোঁয়া লাগে তাঁরই সেই পিয়ানোর ডালায়। পিয়ানোর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেই, ১৬/১৭ বছর আগেও দেখা যেত, দক্ষিণের জানালার পাশে নিজস্ব কালচে-লাল চেয়ারটিতে বসে, আপন মনে কাজ করছেন সত্যজিৎ রায়। কাজ তো নয়—যেন ধ্যান। তাঁর হাতে ফাউন্টেন কলম, কখনও তুলি।

সেই পিয়ানোর পাশেই এখন হাজির স্টিলের এক আলমারি। সেটার কাচের ভিতর সারি সারি সাদা প্যাকেট। তাদের গায়ে ছিমছাম ছাপানো হরফে লেখা বাঙালির আকৈশোর প্রিয় কয়েকটি নাম—'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অশনি সংকেত', 'জন-অরণ্য', 'আগন্তুক'...। কতবার এ-সব নাম দেখেছি বিজলী, পূর্ণ, প্রাচী, মিত্রা, মিনার বা প্রিয়া-র বাইরের দেওয়ালে! বিরাট-কাপড়ে মোটা-তুলি দিয়ে নামগুলি এঁকে টাঙানো। বুঝতে অসুবিধে নেই, আলমারির সাদা ওই প্যাকেটের সারিতে আছে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের খাতা। তাঁর নিজেরই হাতে লেখা ও আঁকা। লাল কাপড়ে বাঁধানো।

বাক্সের গায়ে লেখা নামগুলোর মধ্যে মাত্র একটি নাম কখনও দেখিনি কোনো সিনেমা হল-এর দেওয়ালে।

সত্যজিৎ রায়ের 'মহাভারত'!

তার মানে 'মহাভারত'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন সত্যজিৎ। লেখালেখিও করেছিলেন। কিন্তু শুটিং শুরু করেননি।

আশ্চর্য! এত দিন ধারণা ছিল, আমাদের সমকালের ভারত নিয়েই বুঝি তিনি আগ্রহী। আমাদের অন্নাভাব, আমাদের বেকার সমস্যা, আমাদের ধর্মান্ধতা, আমাদের দুর্নীতি, আমাদেরই মেয়েদের মাথা তুলে দাঁড়ানো। যে-ছবিটিতে সবচেয়ে দূরে পেছন ফিরে তিনি তাকিয়েছেন, তার নাম 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', ১৮৫৭-র বাস্তব রাজনীতি নিয়ে কাহিনি। তার ওপারে, পেছন ফিরে প্রকাশ্যে তাকানো হয়নি তাঁর।

সে ভুল ভেঙে দিল 'মহাভারত'-লেখা ওই খাতা।

সন্দীপ রায়, মানে আমাদের বাবুদার অনুমতি নিয়ে সেই 'মহাভারত' পড়তে চাইলাম একদিন। তাই বলে আসল খাতাটা ছুঁয়ে দেখার দরকারই নেই। স্ক্যানিং-এর যুগ। ওই খাতার প্রতিটি পাতা স্ক্যান করে সিডি করা আছে—কম্পিউটারে খুলে

দেখলেই হলো! পাতার পর পাতা পড়া যাবে, দরকার হলে পাণ্ডুলিপির অক্ষর এনলার্জ করে নিয়ে।

সিডি চালিয়ে দেখলাম, ওই খাতার প্রতি পাতায় ব্যাসদেবের ভারতবর্ষকে নতুন করে চিনতে চেয়েছেন সত্যজিৎ রায়। স্বয়ম্বর সভায় কেমন গান গেয়ে গুণকীর্তন করা হতো পাণিপ্রার্থী রাজাদের। কী কী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো যুদ্ধক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্র দর্শনে এসে নিদারুণ কোন সত্য উপলব্ধি করেছিলেন গান্ধারী। পাতার পর পাতা পড়তে-পড়তে মনে ফুটে ওঠে 'মহাভারত'-এর অন্য এক রূপরেখা। কিছুটা আধুনিক এইরূপ : সসম্ভ্রম, কিন্তু অহেতুক ভক্তিহীন।

অন্তত এ-টুকু প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রাচীন ভারত নিয়ে সত্যজিতের আগ্রহ তাঁর শিল্পীজীবনের শুরু থেকেই। খাতার প্রথম পাতার তারিখ মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, ছবি হলে 'মহাভারত' শেষ হতো 'অপুর সংসার'-এর আগে। কিংবা একটু পরেই। কারণ, এই খাতারই শেষের দিকে লেখা আছে 'অপুর সংসার'-এর প্রথম দৃশ্যের কিছু সংলাপ। আর একটি পাতায় আঁকা 'দেবী'-র বিরাট এক হোর্ডিং-এর নকশা। তার মানে, 'অপুর সংসার' ও 'দেবী' তৈরির সময় সমান তালে, সমান্তরাল চলেছে 'মহাভারত'-এর পরিকল্পনা।

যেহেতু শিল্পীজীবনের শুরুতেই তিনি ফিরতে চেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতে, তাই মেনে নিতে পারি, প্রাচীন ভারত ছিল তাঁর ধমনীতে।

রক্তেই যখন ছিল, তখন শুধুই কোনো কাহিনি নয়—ভারতীয় লোকাচার থেকে দর্শনের নানা ধারাও নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁকে। আজ দেখব, চিরকালের ভারত বারবার কী-ভাবে উঁকি দিয়েছে তাঁর আধুনিক ছবিতেও, হয়তো ছুঁয়ে গিয়েছে পলকের জন্য; তবু চমকে দিয়ে গিয়েছে। যেমন ভূতের রাজার বর!

ভূতের রাজা ক'টা বর দিতে চেয়েছিলেন গুপী-বাঘাকে? তিনটে! বলেছিলেন—

'...ভূতো রাজা খুশি হলে বর দিই
তিন বর, তিন বর, তিন বর!'

'কঠোপনিষদ'-এ যমরাজও তুষ্ট হয়েছিলেন নচিকেতার ওপর। ভূতের রাজার মতোই খুশি হয়ে বর দিতে চেয়েছেন! ক'টা বর? তিন!!

যমরাজের বক্তব্য উদ্ধৃত করি 'কঠোপনিষদ' থেকে। খাঁটি দেবভাষার নচিকেতাকে তিনি বলেছিলেন :

'ত্রীণ্ বরান্ বৃণীষ্ব'

সাদা বাংলায় : 'তিনটি বর প্রার্থনা করো।' এই মিল শুধুই কাকতালীয়? নাকি, এভাবেই কোনো দেশের পুরাণ হঠাৎ কথা বলে ওঠে দেশের আধুনিক শিল্পীর মধ্যে দিয়ে?

'কঠোপনিষদ্'-এর সংলাপই কি উপেন্দ্রকিশোরের কলম ছুঁয়ে ফিরে এল সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে?

খুবই স্বাভাবিক। কারণ, উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে পুরাণের যোগ ছিল নিবিড়। পুরাণের বহু গল্প তিনি বাংলায় লিখেছেন ছোটদের জন্য। আর পিতামহের সেই সব লেখা সত্যজিৎ পুনর্মুদ্রিত করেছেন নিজের 'সন্দেশ'-এ। নিজে ছবিও এঁকেছেন।

এমনই কত সাংস্কৃতিক সূত্র ছড়িয়ে থাকে মহৎ শিল্পীদের কাজে। যার মধ্য দিয়ে নতুন করে কথা বলে দেশের অতীত। আজ খুঁজে নেব তেমনই কয়েকটি সূত্র।

সাংস্কৃতিক সূত্র

সত্যজিতের ছবিতেই সন্ধান করব কয়েকটি সাংস্কৃতিক ইঙ্গিত। এমন সংকেত, যা এক পলক দেখলে বা শুনলেই মনে পড়ে আরও অনেক কিছু : আমাদের জাগতিক স্মৃতি থেকেই। যেমন 'কাপুরুষ'-এ। করুণার *(মাধবী)* বাড়িতে অমিতাভ *(সৌমিত্র)* প্রথম ঢোকার মুহূর্তেই আবহে বেজে উঠেছিল নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র দু'চার কলি—

"'অর্জুন! তুমি অর্জুন!'
'হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে—
নাই ভয়।
অহো, কী অদ্ভুত কৌতুক।'
'অর্জুন! তুমি অর্জুন!'..."

এটুকুই শুনেছিলাম। 'অর্জুন! তুমি অর্জুন!' বলে চিত্রাঙ্গদার হাহাকারের আকস্মিকতা আঘাত করে আমার হৃদয়ে। কারণ, এতক্ষণ পেট্রল পাম্প ও গাড়ি রিপেয়ার-এর সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়েছিল দর্শকদের। তাই আমরা প্রস্তুত ছিলাম না এই হাহাকার শোনার জন্য। আমাদের স্মৃতির দ্বার খুলে দেয় বিলাপের এই ঝাপটা।

আসলে গ্রামোফোনে করুণা বাজাচ্ছিল 'চিত্রাঙ্গদা'। বাড়িতে হঠাৎ অতিথি— তাই গান বন্ধ করে দিল সে। আর কোনো কলি তাই শুনিনি। তবু পুরো 'চিত্রাঙ্গদা' মনে আসে আমাদের, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো। মনে হয়, 'কাপুরুষ'-এর অমিতাভ কি পারবে 'অর্জুন' হয়ে উঠতে? অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার আকস্মিক দেখা যেমন উত্তীর্ণ হয়েছিল অস্থায়ী এক প্রেমে—করুণার সঙ্গে অমিতাভের এই অভাবনীয় দেখাও কি তেমনই এক প্রেমে উন্নীত হবে আবার? সেই কলেজের দিনগুলোর মতোই। হোক না অস্থায়ী—অমিতাভ কি পারবে না 'অর্জুন' হয়ে উঠতে? জীবনে অন্তত একবার?

দর্শকের মনে এই প্রশ্ন সঞ্চারিত করার জন্য সত্যজিৎকে দশ মিনিট ধরে 'চিত্রাঙ্গদা' শোনাতে হয়নি। 'অর্জুন! তুমি অর্জুন!'—এই এক কলিই শুধু স্পষ্ট বেজেছিল। সেটুকুই যথেষ্ট।

'চিত্রাঙ্গদা'র বেলায় যা সত্যি—তা সত্যি হওয়া উচিত অন্যান্য সাংস্কৃতিক সূত্রের বেলাতেও। যেমন, বাংলার মেয়েদের কোনো ব্রতকথার একটি পদ শুনলেই বাকিটুকু আমাদের মনে পড়বে না, তা কি হয়? 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' তো এখনও পড়া হয় ঘরে

ঘরে। তাহলে মা লক্ষ্মীর সূত্র ছবিতে এলেই আমাদের মনে আসা উচিত লক্ষ্মীর পাঁচালীর নানা প্রসঙ্গ—যেমন, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা! 'কষ্টকল্পনা' বলে এই 'মনে আসা'কে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? যে-দর্শকের মনে এ-সব স্মৃতি জেগে ওঠে না—তাঁরই জাতিগত স্মৃতি সীমিত। তিনিই হয়তো যথেষ্ট বাঙালি নন।

পুণ্যি-পুকুর

এক দুপুরে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে 'পথের পাঁচালী' ছবিতে। দুর্গা মেঘ আর বৃষ্টি দেখতে যাবে ভাইকে নিয়ে। বৈশাখ মাস। দুপুর—শেষে কালবৈশাখীর মেঘ যতই ঘন হয়ে আসুক, সব ফেলে চট করে দুর্গার বেরনোর কোনো জো নেই। কারণ, আগে পুণ্যি-পুকুর ব্রত সেরে নিতে হবে বাড়ির উঠোনে। আঙিনার মাটিতে ছোট্ট এক চারকোণা গর্ত কেটেছে দুর্গা। সেটাই পুকুর। 'পুণ্যি-পুকুর'! বেলগাছের পাতাশুদ্ধ সরু একটা ডাল পোঁতা পুকুরের মাঝখানে। মন্ত্র আউড়ে সেই গর্তে ঘটি থেকে জল ঢালতে হবে তিনবার। তবে দুর্গার ছুটি। ওদিকে মেঘ এখন আরও ঘন। দিদির অপেক্ষায় একাই মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে অপু। তখন কী মন্ত্র বলল দুর্গা?—

'পুণ্যি-পুকুর পুষ্পমালা
কে পুজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
ভাইয়ের বোন—পুত্রবতী ॥'

এ-রকম আরও পদ আউড়ে, নিজেরই কাটা 'পুণ্যি-পুকুর'-এ কাঁসার ঘটি থেকে জল ঢালল দুর্গা। তারপর গড় হয়ে পুকুরকে প্রণাম করেই দৌড় দৌড়! মাঠে পৌঁছানোর আগে আর থামা নেই।

দুর্গা যখন গলায় আঁচল দিয়ে খুদে ওই পুকুরের পাশে মাথা নোয়াচ্ছে, দেখেছি তখন অনেক দর্শকের চোখে জল। কেন? তার সহজ একটা কারণ মনে আসে। সকলেই জানি, এই-যে দুর্গা আকাশ-ভাঙা মেঘ দেখতে মাঠে বেরবে, সেটাই হবে ওর শেষ বেরনো। আজ ওর জ্বর আসবে বৃষ্টিতে ভিজে। আর সে জ্বর সারবে না। পুণ্যি-পুকুর মন্ত্র শুনতে-শুনতেই সে-কথা মনে আসে। তাই চোখে জল।

আরও কারণ আছে। সেই কারণটা গেঁথে আছে বাঙালি জাতির স্মৃতির মধ্যে। ঠাকুমা-দিদিমার কোলে দোল খেতে-খেতে সেই কারণটা কবে যেন আমরাও জেনে ফেলেছি। জানি, ব্রতকথার মধ্যেই ধরা আছে চিরকেলে বাঙালি মেয়ের ইচ্ছেগুলো। স্বপ্নগুলো। যেমন গুপী-বাঘা যে তিনটে বর চেয়েছে ভূতের রাজার কাছে, ওই তিন বরেই ধরা আছে বাঙালির যত 'চাওয়া'—বাঙালি কী চেয়ে এসেছে এতকাল। মেয়েদের ব্রতকথাও তা-ই।

যারা শুধুই শহুরে, তাদের 'চাওয়া'গুলো আজ অনেকটাই আলাদা। এটাই নিয়ম। তা সত্ত্বেও প্রাণে আজও দোলা দেয় ব্রতকথার পদ। কারণ, ওরা আজও রয়ে গিয়েছে বুকের অতলে।